শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের জগৎ

গোপা দত্তভৌমিক

এক

প্রশান্ত মহাসাগরের নির্জনে দ্বীপ হাইতিতে বাসকালে নিঃসঙ্গ রবার্ট লুই স্টিভেনসন সেখানকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের ডেকে গল্পের আসর জমাতেন, এই তথ্যটি বাঙালি পাঠককে জানিয়েছিলেন সুকুমার সেন। গল্পমুগ্ধ কালো মানুষেরা স্টিভেনসনকে ডাকত নিজেদের ভাঙাভাষায় 'টুসি টালা' অর্থাৎ story teller বা গল্পবলিয়ে। সুকুমার সেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে স্টিভেনসনের তুলনা টেনেছেন। শরৎচন্দ্রের আসন তর্কাতীত, কিন্তু এ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে যে কয়েকজন সেরা গল্পবলিয়ে, দ্বীপবাসীদের ভাষায় 'টুসিটালা', আছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। প্রজন্মপর ম্পরায় বাঙালি পাঠক তাঁর গল্পে মুগ্ধ হয়ে আছেন। রচনাবলির তুমুল বিক্রি ছাড়াও চলচ্চিত্রে দূরদর্শনে তাঁর কাহিনীর র মপায়ণ চুম্বকের মতো টেনে নিয়েছে দর্শককে। আর এখানেই হয়তো সাহিত্যিক হিসেবে তাঁকে একটি সংকটের মুখে দাঁড় াতে হয়। সাধারণের মন জয় করার এই সহজাত ক্ষমতা অনেক বিদগ্ধ সমালোচকের ভ্রুকুটির জায়গা। ১৯৪৮ সালে দিনলিপিতে শরদিন্দু লিখেছিলেন, 'বাংলা সাহিত্যে যাঁহারা সাহিত্য বিচারক বলিয়াপরিচিত তাঁহারা আমার লেখা লইয় া ঘাঁটঘাঁটি করিতে চাননা লক্ষ্য করিয়াছি।' প্রমথনাথ বিশী এবং জগদীশ ভট্টাচার্য দুজনকেই তাঁর ব্যতিক্রম বলে মনে হয়েছিল। তাঁর গল্প প্রসঙ্গে প্রশংসার্থেই 'entertaining' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন মোহিতলাল মজুমদার। শরদিন্দু নিজেও নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন যে তিনি দ্রষ্টা, ঋষি, জ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী বা বিশ্লেষণে নিপুণ পণ্ডিতনন, তিনি কবি, রূপ - চিত্রকর কোনো ism নয়, গল্প রচনা করে 'পাঠককে আনন্দ দিতে চাই, রসসৃষ্টি করাই আমার স্বধর্ম।'

প্রকৃতপক্ষে প্রবল জনপ্রিয়তা যেমন একজন সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠতার মাপকাঠি নয়, প্রতিবন্ধক -ও নয়। শরদিন্দু লক্ষকরেছিলেন তাঁর লেখায় যুগপৎ দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, 'immediate appeal'এবং 'delayed action'। ১৯৯৯ স ালে তাঁর জন্ম- শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। কালের যে দূরত্বটি নিরপেক্ষ শিল্পবীক্ষায় সাহায্য করে, তাঁর ক্ষেত্রে সেটি হয়তে া আমরা অনেকটাই পেয়ে গেছি। পরিবর্তিত দেশকাল মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে তাঁর গল্পগুলি আজ আমাদের চেতনা গুলে াকে কী ধরনের সাড়াজাগায় বর্তমান প্রবন্ধে তারই একটি পরিচয় দেরার চেষ্টা হবে। আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন কবিতা, নাটক, উপন্যাস, চিত্রনাট্য বিভিন্ন ধারাতে সঞ্চরমাণ হলেও ছোটগল্পেই তাঁর লেখনী সর্বাধিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে। গল্প লিখেই যে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছেন তা লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন।

প্রবাসী বাঙালির অধুনালুপ্ত গৌরবময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যটির কথা শরদিন্দু প্রসঙ্গে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। উনিশ শতকে নব্য পাশ্চাত্য শিক্ষায় সত্য আলোকিত বাঙালি ভারতবর্ষের মানচিত্রকে জীবিকান্বেষী চোখ দিয়ে নতুন ভাবে চিনেছিলেন। বিভিন্ন বৃত্তি নিয়ে শিক্ষিত বাঙালিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, অর্জন করেছিলেন ঈর্ষণীয় বিত্ত, প্রতিষ্ঠা। একদিকে এই প্রবাসী শ্রেণীটির সঙ্গে সর্বভারতীয় মূল স্রোতের জীবনধারার সরাসরি যোগ ঘটেছিল, অন্যদিকে খাঁটি বাঙালিয়ানা ছিল তাঁদের মজ্জাগত। বিশিষ্ট এই সাংস্কৃতিক মিশ্রণের ফলে প্রবাসী বাঙালি পরিবার সম্ভূত অনন্য এক লেখকগোষ্ঠী পেয়েছি আমরা। শরৎচন্দ্রকে দিয়ে তালিকা শু করে মনে পড়বে অতুলপ্রসাদ সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, জ্যোতির্ময়ী দেবী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী এবং আরো অনেকের বিস্ময়কর দানের কথা। প্রবাসী বাঙালির জীবনচর্যা, সাহিত্যচর্চা একটি বিশেষক ালের পটভূমিতে যে ঋদ্ধরূপ নিয়েছিল, এঁদের সাহিত্যকর্ম তারই অভিজ্ঞান হয়ে রয়ে গিয়েছে।

জৌনপুরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করলেও শরদিন্দুর শৈশব, কৈশোর এব যৌবনের অনেকখানি কেটেছে মুঙ্গেরে। তাঁর পিতা প্রসিদ্ধ আইনজীবী তারাভূষণ এবং মা বিজলীপ্রভা দুজনেই বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। মুঙ্গের জেলা স্কুলের দুই শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র চত্রবর্তী এবং কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দুর বাংলা সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। আজ হিন্দির পরাত্রমে জমি ছাড়তে ছাড়তে প্রায় নিরাশ্রয় আঞ্চলিক ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা আর কোনোপৃথক মর্যাদা পায়না। প্রবাসী বাঙালির কাছে খাঁটি বাঙালিয়ানা হয়তো আর একেবারেই প্রয়োজনীয় নয়। প্রবল ঝিায়নের স্রোতে ভাসমান পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরই বা কত শতাংশ তাতে আগ্রহবোধ করবেন বলা মুশকিল। 'বাঙলীরহিন্দীচর্চা' প্রবন্ধে রাজশেখর বসু রাষ্ট্রভাষার অনুশীলনে শরদিন্দুকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। শরদিন্দুর প্রতিত্রিয়া ছিল, 'ভাষার সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতা থাকলে রসসৃষ্টি করা যায় হিন্দীভাষার সঙ্গে আমার সে অন্তরঙ্গতা নেই।' একদিকে নিজের ভাষার সঙ্গে নাড়ীর যোগ, অন্যদিকে বৃহত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার শরদিন্দুর মধ্যে এই দুই দিক বিরোধহীন সুষমায় মিলিত হয়েছিল।

দেশপ্রেম, গাঢ় জাতীয়তাবোধ, রোমান্টিক জীবনদৃষ্টি আত্মোপলব্ধির নানা বিচিত্র স্তর মিলিয়ে উনিশ শতকীয় বাঙালির যে বিখ্যাত ঐতিহ্য মনোধর্মে শরদিন্দুর শিকড় সেখানেই দৃঢ় ভাবে প্রোথিত। সঙ্গত কারণেই তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আদর্শ লেখক। একদা বাংলা উপন্যাসে বঙ্কিমী প্রভাব এমনই প্রবল ছিল য়ে রোমান্সধর্মী রাজপথ দিয়ে জগৎসিংহের ঘোড়ার মতই লেখার স্রোত ছুটে চলছিল, কিন্তু ১৯১৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরের অবকাশটি শরদিন্দু যখন সাহিত্যপাঠ করে কাজে লাগাচ্ছেন তখন সেই দুরন্ত প্রভাব অনেকটাই স্তিমিত। শরদিন্দু কিন্তু একদিকে যেমন মুখস্ত করে ফেলেছেন বীরাঙ্গনা ও মেঘনাদবধ, অন্যদিকে প্রাণের 'সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোচ্চ' আসনে বসাচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। তাঁকে আপ্লুত করছে আনন্দমঠ, 'চ্যাপমানের হোমর পড়িয়া বোধ করি কীটসের এমনি হইয়াছিল।' পরবর্তীকালে দেশবিদেশের সাহিত্য পরিত্রমা করেও 'পুরাতন দেবতাটিকে' আসনচ্যুত করা দূরে থাক, তাঁর ভক্তি দৃঢ়তর হয়েছে। ত্রমে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স সৃষ্টিতে গুর মত শিষ্যও সমান পারঙ্গম হয়েছেন।

প্রায় বঙ্কিমের প্রতিধবনি শুনতে পাই শরদিন্দুর কণ্ঠে যখন তিনি বলেন, 'বাঙালী যতদিন না নিজের বংশগরিমার কথা জানিতে পারিবে ততদিন তাহার চরিত্র গঠিত হইবে না ; ততদিন তাহার কোনও আশা নাই। যে জাতির ইতিহাস নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই।' এই 'ঐতিহাসিক' পিছুটানের একটি কারণ নিশ্চয়ই উপর্যুক্ত দেশাত্মবোধ, আত্মবিস্মৃত, পরপদানত জাতিকে অতীত কথা স্মরণ করিয়ে বিনষ্ট গৌরব পুনদ্ধারের ব্রত পালন। অন্যদিকে সম্পর্কের গভীরে ডুব দেওয়ার ক্ষেত্রেও বঙ্কিমের অন্যতম অবলম্বন ইতিহাস। আমরা সকলেই জানি সমকালীন বাস্তবের বিবর্ণতা বঙ্কিমের উদ্দীপ্ত কল্পনাকে ঠিক রসদ যোগাতে পারেনি। অন্নদাশঙ্করের ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'প্রেমের উপন্যাস লিখতে হলে যাঁদের নিয়ে লিখতে হয়, তাঁরা হলেন পূর্ণবয়স্কনারী। কিন্তু আট বছরে যাদের বিয়ে হয়ে যায় তাদের নিয়ে প্রেমের উপন্যাস লেখা যায়না।... উপন্যাসের উপাদান পেলেন ইতিহাস থেকে এবং কল্পনা থেকে। ... আসলে তাঁর আমলে সমাজে সেরকম নারী পাওয়া যেত না।' (প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস / নববই পেরিয়ে)

বঙ্কিমের উত্তরাধিকার রয়েছে শরবিন্দুর ভাষাশৈলীতে, নিখুঁত প্লটে, নাটকীয় ঘটনাবিন্যাসে। কিন্তু দুজনকে যে সমানধর্মা বলে মনে হয় তার প্রধান কারণ গড়পড়তা ঘটনা সাহিত্যের উপাদান হিসেবে এঁদের দুজনকেই আকৃষ্ট করেনি।
শরদিন্দুর অতীত প্রয়াণেরও একটি প্রধান কারণ খাঁটি রোমান্টিক মনের তীব্র অতৃপ্তি। কখনো নিত্তাপ বর্তমান, বাঙালি মধ্যবিত্তের ঘটনাহীন একঘেয়ে জীবন থেকে মুখ ফিরিয়েছে তাঁর কল্পনা, সতেজ বিপ্রতীপতায় উপস্থিত হয়েছে অতীত। জাতিস্মর নায়কের বিলাপে লেখকের নিজস্ব আক্ষেপই যেন ধবনিত, 'বিদ্যুৎশিখার মতো, জ্বলন্ত বহির মতো রূপ লইয়া আজ সেই নারীকুল কোথায় গেল?... এখন যাহারা আছে তাহারা তেলাপোকার মতো অন্ধকারে বাঁচিয়া আছে। তখন নারী ছিল অহির মতো তীব্র দুর্জয়। আরণ্য অগ্নীর মতো তাহাদিগকে বশ করিতে হইতে।...একালের মানুষ যেন সব দিক দিয়াই ছোট হইয়া গিয়াছে। দেহের, মনের, হৃদয়ধর্মের সে প্রসার আর নাই। যেন মানুষ তখন তণ ছিল, এখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে।'

শরদিন্দুর আঁকা অতীতছবিতে তাই প্রাচীন পৃথিবীর বর্ণাঢ্য উজ্জ্বল জীবন আশ্চর্য এক সৌন্দর্য জগৎ তৈরি করে, কালিক দূরত্বের মায়াময় কুয়াশায় মোড়া সেই ছবির আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। ইতিহাসের পর্যায়গুলিকে কখনো গেঁথে রেখেছে একটি জাতিস্মর চরিত্র, লক্ষণীয় তার হতশ্রী বর্তমান, ছিয়াত্তর টাকা মাহিনার রেলের কেরানী।' জন্মান্তরের স্মৃতি উদ্বেলিত হলে আপাতদৃষ্টিতে এলেবেলে ব্যক্তিটির অস্তিত্বে জাদুদণ্ডের ছোঁওয়া লাগে। রোজকার জীবনের তুচ্ছতা থেকে ডানা মেলে গল্প ঝাঁপ দেয় রোমান্সের অসীম সম্ভাবনাময় আকাশে। জাতিস্মর নায়কের সহযাত্রী হয়ে আমরা 'মাহরণের' বর্বর আদিম জগতে উপস্থিত হই। গুহামানব গাক্কা যেখানে তিক্তি আর হুড়ার কাছে চূড়ান্ত অপমানিত হয়ে স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছে এবং আকস্মিক ভাবে দেখতে পেয়েছে উন্নততর এক মানবগোষ্ঠীকে। পশুপালন, বস্ত্রবয়ন, অগ্নিপ্রজ্বলনের বিদ্যা যাদের অধিগত, যারা জানে বর্তুলাকার মাটির পাত্র তৈরি করতে। সভ্যতার সোপান পরম্পরায় মানুষের বিস্ময়কর অভিযাত্রার তথ্যগুলিকে সুনিপুণভাবে বিন্যস্ত করেন শরদিন্দু। ইতিহাস সংস্কৃতি সাহিত্যের নিবিড় পাঠ ও মননের সঙ্গে মেশে শিল্পীর তুলির টান। প্রতিটি ছবি আঁকেন অখণ্ড মনোযোগে, প্রতিটি রেখার বিভঙ্গে, বর্ণক্ষেপণে, শব্দচয়নে, বাক্যগঠনে ধ্রুপদী গাম্ভীর্যের সঙ্গে উপযোগী গীতলতা, কাব্যিক সাবলীলতা মিশে কথাশিল্পের সমুন্নত মহিমা বিচ্ছুরিত হয়।

গৌতম বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম এবং তৎসঞ্জাত মানবতাবাদকে ঘিরে বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য বৃত্ত রচিত হয়েছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনা থেকে শু করে রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেককেপার হয়ে বাণী বসু বর্যন্ত তার যাত্রা। তথাগতের জীবনদর্শন, বৌদ্ধ জীবনচর্যা শরদিন্দুর ঐতিহাসিক গল্পসমূহে ফিরে ফিরে এসেছে. তাঁর জাতিস্মর কল্পনাতেও বৌদ্ধপ্রভাব বিদ্যমান লক্ষ করেছেন সমালোচকেরা। 'জাতিস্মর' নামে ছোট লেখাটিতে শরদিন্দু প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যে জাতিস্মর প্রসঙ্গ সন্ধান করেছেন কিন্তু একমাত্র বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী সম্পর্কেই তিনি মন্তব্য করেছেন, 'বুদ্ধদেবের পূর্ব পূর্বজন্মের ঘটনারূপ জাতিস্মর-শৈলীতে লিখিত।' জাতিস্মর-শৈলী শব্দপ্রয়োগ লক্ষণীয়।
অমিতাভ, মৃৎপ্রদীপ বা চন্দনমূর্তি গল্পে কণাঘন বৌদ্ধ প্রতিবেশ গড়ে উঠেছে। স্মরণীয় শাক্যসিংহ গৌতমকে দেখেশ্রেণিনায়ক কুমারদত্তের বিহ্বল অনুভুতি, 'কে ইনি? এত মধুর, এত কণাসিক্ত মুখকান্তি তো মানুষের কখনও দেখি নাই।...চক্ষুর মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই মনে হয়, ভিতরে অমিতদ্যুতি স্থির সৌদামিনী জ্বলিতেছে। কিন্তু সে সৌদামিনীতে জ্বালা নাই, তাহা অতি স্নিগ্ধ, অতি শীতল যেন হিম-নির্ঝরিণীর শীকর-নিষিক্ত।' কুমারদত্তের বুদ্ধশরণ মনে করিয়ে দেয় বাঙালির মর্মতলে স্থায়ীভাবে জেগে থাকা বুদ্ধের 'নিরঞ্জন আনন্দমুরতি এবং 'কণ আঁখিদুটি'র বিখ্যাত রাবীন্দ্রিক বর্ণনা।

শবদিন্দুর এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প নিঃসন্দেহে 'ম ও সঙঘ'। মধ্য এশিয়ার দিকসীমাহীন মভূমির মধ্যে বালুকাসমাহিত সঙঘারামের ভিক্ষু পিথুমিত্ত, উচণ্ড, নির্বাণ এবং ইতি, তিনজন পুষ ও এক নারীকে ঘিরে মানবহৃদয়ের আদিমতম বাসনার উত্তাল সংক্ষোভ এবং ভয়াবহ বিনাশে একটি গাঢ় ট্রাজিক পরিণাম রচিত হয়েছে। গল্পটির কেন্দ্রে আছে ভিক্ষু উচণ্ডের তীব্র যৌন ঈর্ষা, নির্বাণ ও ইতির সহজ স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্ককে প্রবল জিঘাংসা নিয়ে তিনি হনন করতে উদ্যত হয়েছেন। থের পিথুমিত্তের কণার্দ্র ক্ষমা সর্বনাশকে রোধ করতে পারেনি, গল্পশেষে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা নিয়ে মভূমিতে হারিয়ে গেছে নির্বাণ ও ইতি। ফিরে এসেছে ভয়ংকর আঁধি, নিজের ভুল বুঝতে পেরে উচণ্ড তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য নিষ্ফল যাত্রা করেছেন মৃত্যুঅভিমুখে। একদিকে উচণ্ডের কামনা, ঈর্ষা ও নিষ্ঠুরতা অন্যদিকে পিথুমিত্তের কণা ও প্রেম দুয়ের দ্বন্দ্বে বুদ্ধবাণীর শাশ্বত প্রতিষ্ঠায় গল্পের সমাপ্তিটি প্রতীকী ব্যঞ্জনা পেয়েছে। 'অসতো মা সদ্‌গময়' এই শ্রুতিবাক্য বৌদ্ধশ্রমণের মুখে দেওয়ায় বিচলিত হয়েছিলেন মোহিতলাল, কিন্তু এই মন্ত্র 'শমন-ধৃত' মানবজাতির বিপন্নতার পটে লেখককে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে তার পরিচয় পাই ডায়েরিতেও, মহাত্মাজীর মৃত্যুর এক বৎসর উদ্‌যাপনে তিনি যখন একই উচচারণ করেন।

তাঁর ইতিহাসাশ্রিত গল্পগুলিতে পাঁচ হাজার বছর আগের মিশর, আর্য-অনার্য সংঘযুগের ভার, শিশুনাগ বংশের অন্ত্যকাল, গুপ্তযুগের আদিপর্ব বা সুবর্ণ পর্ব, মধ্যযুগের নবদ্বীপ--পটভূমি যাই হোক না কেন গ্রাফিক বর্ণনা বিশিষ্ট কালের ফ্রেমে ছবিটিকে প্রত্যক্ষবৎ উপস্থাপিত করেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে নেওয়া যাক

‘তখন সেই সংজ্ঞাহীন দেহ সন্তর্পণে বক্ষে তুলিয়া মহারাজ আরোহনে শিবিরে ফিরিয়া চলিলেন। মূর্ছিতার অবেণীবদ্ধ মুক্ত কুন্তল কৃষ্ণ ধূমকেতুর মতো পশ্চাতে উড়িতে উড়িতে চলিল।’ (মৃৎপ্রদীপ)

‘মেকা মনে মনে নিজের ভবিষ্যৎ জীবন কল্পনা করিল। একজন মাংসলোলুপ সেনাপতি তাহাকে লইয়া যাইবেন। কিছুদিন পরে তাহার ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ হইলে তিনি তাহাকে দাসীহাটে বিক্রয় করিবেন। কোনও মধ্যবিত্ত ব্যক্তি তাহার ক্লান্ত-যৌবন দেহটা ক্রয় করিবে। আবার কিছুকাল পরে সেও তাহাকে কোনও দরিদ্র কৃষকের কাছে বিক্রয় করিবে। তারপর একদিন তাহার ভগ্ন জীর্ণ দেহটা নদীর গর্ভে সমাধিলাভ করিবে।’ (আদিম)

‘পরিখার পরপারে কিছুদূর যাইবার পর গঙ্গাতটে পাটলিপুত্রের মহাশ্মশান আরম্ভ হইয়াছে ; -- যতদূর দৃষ্টি যায়, তণ্ড ল্মহীন ধু ধু বালুকা। বালুকার উপর অগণিত লৌহশূল প্রোথিত রহিয়াছে, শূলগাত্রে কোথাও অর্ধপথে বীভৎস উলঙ্গ মনুষ্যদেহ বিদ্ধ হইয়া আছে, কোথাও শুষ্ক নরকঙ্কাল শূলমূলে পুঞ্জীভূত হইয়াছে। চারিদিকে শতশত নরকপাল বিক্ষিপ্ত।’ (বিষকন্যা)

‘চুল্লীর আলোকে তণ্ডুর মুখের প্রত্যেক রেখাটি দেখিতে পাইতেছি। শীর্ণ, রক্তহীন মুখ ; গুম্ফ ও ভ্রুর রোম চুল্লীর দাহে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, গণ্ডের চর্ম কুঞ্চিত হইয়া হনু-অস্থিকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। ললাটের দুই প্রান্ত নিম্ন। অস্থিসার বক্র নাসিকা এই জরাবিধবস্ত মুখের চর্মাবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইবার প্রয়াস করিতেছে। মুখখানা দেখিলে মনে হয় মৃতের মুখ, শুধু সেই মৃত মুখের মধ্যে কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষুদুটি অস্বাভাবিক রকম জীবিত,-ভগ্নমে মুমূর্ষু সর্পের চক্ষুর মতো যেন একটা বিষাক্ত জিঘাংসা বিকীর্ণ করিতেছে।’
(সেতু)
‘সাপুড়ের ঝাঁপি খোলা পাইয়া কৃষ্ণকায় সর্পী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনই একটি নারী পেটারির মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নীলাঞ্জন চোখে ধিকি ধিকি বিদ্যুৎ।’ (প্রাগ্‌জ্যোতিষ)

অতীত পৃথিবীর এই বিচিত্র চলচ্ছবিতে কখনো দেখা দিয়েছে আটবিক জীবন, বন্য, সরল, সতেজ। প্রাগ্‌জ্যোতিষেরকে াদণ্ডকন্যা এলা বা ‘রেবা রোধসি’-র নারীরা মনে করিয়ে দেয় পল গগাঁর ছবি, ‘তাহাদের নিরাবরণ বক্ষে বনজ ফুলের ম ালা, কেশকুণ্ডলিতে শিখিচূড়া।’

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় রচিত ‘ফিরিঙ্গি বণিক’ গ্রন্থটি থেকে শরদিন্দু রক্তসন্ধ্যা গল্পটির প্রেরণা পেয়েছিলেন।ফিরিঙ্গি ও মূল বণিকের সংঘাতকে কেন্দ্র করে ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে প্রতীচ্যশক্তির আগ্রাসনের সূচনাপর্ব এই গল্পে স্থান পেয়েছে। লেখক তুলনাহীন নিষ্ঠুরতার ছবি এঁকেছেন আশ্চর্য সংযমে। এই গল্পের জাতিস্মরতার ফ্রেম প্রসঙ্গে অবশ্য মো হিতলাল স্পষ্টভাবেই বিরূপতা প্রকাশ করেছেন, setting -টা ভাল ফিট করে নাই-- দুইটির মধ্যে নাড়ীর যোগ ঘটে ন াই...।’ কিন্তু এককালের বিখ্যাত অভিযানকারী ভাস্কো-ডা-গামা এ জন্মে একজন সাধারণ গোয়াণব্যবসায়ী এবং মূল বণিক কুলপতি মির্জা দাউদ একজন কসাই-এই বৈপরীত্য কেন মনকে টানে তার যথার্থ ব্যাখ্যা করেছেন সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, ‘বীরত্ব ও গৌরবে ভরা যুগ থেকে আধুনিক মিডিওক্রিটিতে পতন প্রথমেই পাঠকের মনকে নাড়া না দিয়ে পারে না।’

জাতিস্মরবৃত্তেই রয়েছে প্রত্নকেতকী, মায়াকুরঙ্গী বা দেখা হবে’র মতো গল্প। বহুযুগের ওপার হতে ভেসে আসা কেয়ার গন্ধ বা অজন্তার গুহাচিত্র আঁকার স্মৃতি অতীত - বর্তমানের ভেদচিহ্ মুছে একটি অখণ্ড নিঃসীম কালে গল্পগুলিকে উপস্থাপিত করে।

শরদিন্দুর স্কুলের শিক্ষক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বই পড়তে দেন।এই

বইটি পড়ে চৈতন্যের প্রথম জীবন নিয়ে একটি গল্প লেখার ইচ্ছে জাগে। এই গল্পই, চুয়াচন্দন। গল্পসূচনায় নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটের বর্ণনা মনে পড়িয়ে দেয় 'চৈতন্য ভাগবত,'

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।।
ত্রিবিধ বয়সে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতীপ্রসাদে সবেই মহা দক্ষ।। সবে মহা অধ্যাপক করি গবর্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে।।

বৃন্দাবন যাদের 'পাষণ্ডী' বলেছেন গল্পোক্ত মাধব সেই শ্রেণীর। তান্ত্রিক আচার ও অনাচারে মগ্ন অধোগামী সে যুগেরকালিম াচ্ছন্ন পটে মানবতাবাদী নিমাই পণ্ডিতের সামাজিক দায়বোধ গল্পে ফুটে উঠেছে। পুঁথিনিমগ্নতার সঙ্গে যিনি মেলাতে পারেন নিমজ্জমান কানভট্টকে উদ্ধার কিংবা চুয়াকে মাধবের কবল থেকে রক্ষা করার মত সাহসী সৎকাজ।
রাজশক্তির নিপীড়ন, সামন্তপ্রভূর খেয়ালিপনায় সাধারণ প্রজার সর্বনাশের ছবি এসেছে 'তত্ত মোবারক' গল্পে। শরদিন্দুর প্রথম জীবনের স্মৃতিঘেরা ধাত্রীভূমি মুঙ্গের নানা গল্পেই পথঘাট, কেল্লা, পিপরপাঁতি বীথিপথ নিয়ে দেখা দিয়েছে। তত্ত মোব ারক এই মুঙ্গের শহরের এক নাম-না-জানা প্রস্তরশিল্পী ক্বাজা নজর বোখারী, তার পুত্র হতভাগ্য মোবারক এবং পুত্রবধূ পরীবানুর জীবন নেশাতুর শাহজাদা সুজার খামখেয়ালি নৃশংসতার কীভাবে ধবংস হয়ে গেল তারই উপাখ্যান। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় 'শাহজাদা দারাশুকো'তে এই গল্পের পটটিকে কিঞ্চিৎ বদল করে তুলে এনেছেন বাংলাদেশে লাকসাম পাহ াড়ের পায়ে বেতবনের ধারে ভুলুয়া গাঁয়ে। রাজারাজড়ার মর্জিতে সাধারণের জীবন পুড়েখাক হয়ে যাবার ইতিবৃত্তে স্থ ানকালপাত্র ভেদাভেদ অবিচার তো একই থাকে।

মধ্যযুগের পটভূমিতে লেখা 'শঙ্খ কঙ্কণ' বড় গল্পটিতে অনেকের মতে এই অবিচারেরই হয়তো অন্য চেহারা দেখতেপাব অ ামরা। আলাউদ্দিন খিল্‌জির ইন্দ্রিয়পরায়ণ পিশাচতুল্য এক মূর্তি এই গল্পে আঁকা হয়েছে। ইতিহাসে নিষ্ঠুরতার সমান্তর ালে আলাউদ্দিনের অন্যতর পরিচয়ও আছে। নানা পরস্পরবিরোধী দোষগুণের সমাবেশ ঘটেছিল এই বিখ্যাত সুলত ানের চরিত্রে। শরদিন্দুর আলাউদ্দিন অবশ্য একমাত্রিক। রাজা ভূপসিংহ সুলতানের কামনা চরিতার্থ করার জন্য সুন্দরী দ াসী সীমন্তিনীকে পাঠান। রানী বা রাজকন্যার বদলে দাসীকে পাঠিয়ে পিঠ বাঁচাবার এই কৌশল মহাভারতীয় কাহিনীর অনুবৃত্তি বলা যায়। সীমন্তিনীকে সপ্তাহকাল পরে ফেরত দিয়ে আলাউদ্দিন রাজপুরী তল্লাস করে রাজকন্যা শিলাবতীকে ধরে নিয়ে যান। যথাকালে সীমন্তিনী এক কন্যা প্রসব করে এবং নবজাত শিশুকে আঁতুড়ে নুন খাইয়ে মারতে উদ্যত হয়। "কিন্তু ভূপসিংহ নিষেধ করিলেন--'না, আলাউদ্দিনের কন্যাকে বাঁচিয়ে রাখো, হয়তো পরে প্রয়োজন হবে।" অসামান্য র পবতী চঞ্চরী মায়ের বিষদৃষ্টির সামনে বেড়ে উঠল। পরে ময়ূরের সহযোগিতায়ভূপসিংহ তাকে দিয়েই দীর্ঘ দিনের দ্ধ প্রতিহিংসা সার্থক করলেন। ঘটনাচক্রে ফিরে পেলেন শিলাবতীকেও।

চিরশ্রী বিশীকে লেখা চিঠিতে শরদিন্দু জানিয়েছেন, 'গল্পটার মূলকথা হচ্ছে শক্তিমানের বিদ্ধে শক্তিহীনের প্রতিহিংসা।... গঠনের প্রয়োজনে চঞ্চরীকে বুদ্ধিহীনা করতে হয়েছে। সে যদি বুদ্ধিমতী হত তাহলে যে প্রয়োজনে তাকে দিল্লী পাঠানো হয়েছিল তাতে সে সম্মত হত কি ?' চিরশ্রী এই যুক্তি মানতে চাননি বলে মনে হয় কারণ পরে আরেকটি চিঠিতে শরদিন্দু স্মরণ করাচ্ছেন, 'চঞ্চরী আলাউদ্দিনের কন্যা, তার চরিত্রে মানুষীবৃত্তির চেয়ে পাশবী বৃত্তিই বেশি, সে শরীরসর্বস্ব, সূক্ষ্ম ম ানসিক ট্র্যাজেডির সে ধার ধারেনা।' রোবটের মত ব্যবহৃত জড়বুদ্ধি চঞ্চরী প্রসঙ্গে লেখকে র যুক্তি না হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু সীমন্তিনী? সে তো চণ্ড নয়, নবজাত কন্যা পিতার অনিষ্টকারিণী জেনে চণ্ডআদেশ দিতে পারেন 'কন্যার মাতা স্ বহস্তে কন্যাকে শ্মশানে প্রোথিত করিবে।' আর সীমন্তিনী মা হয়ে আপন গর্ভজাত কন্যাকে শুধু সহ্য করতে পারে না তাই নয়, ভূপসিংহের নির্মম পরিকল্পনা জেনেও চঞ্চরীকে ময়ুরের সঙ্গে অনায়াসে দিল্লী পাঠাতে পারে। মেয়েকে বস্ত্রালঙ্কারে সাজাব

ার সময় অবশ্য তার চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরতে দেখেছি, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, এবং শরদিন্দু 'নারী - চরিত্রের জটিলতা কে উন্মোচন করিবে' বলে দায় সেরেছেন।

চণ্ডের আদেশের থেকে ভূপসিংহের প্রতিহিংসা কম পৈশাচিক নয়। গল্পটি পড়বার সময় বারবারই মনে হয় শিলাবতীর উদ্ধ ার, সোমশুক্লা ও ময়ূরের সুখী সফল রূপকথাধর্মী পরিণতির আড়ালে চাপা পড়া সীমন্তিনী ও চঞ্চরীর প্রবঞ্চিত জীবনের ব্যর্থতাকে লেখক আর একটু মূল্য দিতে পারতেন।

সুকুমার সেনের মনে হয়েছিল 'আগেকার ঐতিহাসিক গল্প-উপন্যাসে মোগল-অন্তঃপুরে, শাহী দরবার, আরাবল্লীর গিরিদুর্গ-- এসব নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। শরদিন্দু বাবু তাই মুসলমান অধিকারকালে তিন চারটির বেশি গল্প ফাঁদেন নি।' কিন্তু শুধুই কি চর্বিতচর্বণ এড়াতে চেয়েছিলেন শরদিন্দু? আমাদের মনে পড়ে যায় টয়েনবির A study of History পড়ে তাঁর মন্তব্য,'অপূর্ব গ্রন্থ কিন্তু লেখকের মন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইতে পারে নাই,Western Culture এবং Christianity সম্বন্ধে তাঁহার মনে দুর্বলতা আছে।' হয়তো হিন্দু ও বৌদ্ধযুগ সম্বন্ধে স্বয়ং শরদিন্দুর অনুরূপ দুর্বলতার কথা কেউ কেউ বলতে পারেন। যদিও মধ্যযুগের ভারতবর্ষ বিষয়ে তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্য শুধু গল্প উপন্যাসে নয়, প্রবন্ধসমূহেও প্রকাশিত হয়েছে।

ফারমান প্রবন্ধটিতে হিন্দুমুসলমানের প্রাথমিক সংঘাতের পরে লোকায়ত স্তরে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ প্রক্রিয়া এবং আকবরের উদার সহিষ্ণু অনুমোদনকে সমধিক গুত্ব দিয়ে তিনি বলেছেন 'যদি এই মিলন প্রচেষ্টা আরও একশত বৎসর অব্যাহত থা কিত তাহা হইলে হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানের ধর্মভেদ সম্পূর্ণ ঘুচিয়া যাইত।' ইসলামের সতেজ ঐহিকতার কথা তিনি স্ বীকার করেছেন। কিন্তু সঙ্গীত সাহিত্য স্থাপত্য চাকলা প্রসঙ্গে 'তাহাদের সামান্য যাহা কিছু ছিল' এবং ধর্ম প্রসঙ্গে 'হিন্দুধর্মকে মুসলমান ধর্মের দিবার কিছু ছিল না'---এই দুটি মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের দ্বিধা থাকবেই। পারস্পরিক আদ ানপ্রদানের এই গভীর ইতিহাসে কার কতটা দান তার সূক্ষ্ম তারতম্য দাঁড়িপাল্লা দিয়ে বোধহয় মাপা যাবে না। তবে শাহজ াহানের ১৬৩৪ খ্রীস্টাব্দের বিভেদমূলক ফারমানের দীর্ঘস্থায়ী সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে শরদিন্দুর সিদ্ধান্ত নির্ভূল। যদুনাথ সরকার ফারমানটি এভাবে বিবৃত করেছেন 'Shah Jahan ordered that every Hindu who had taken a Muslim wife must either Embrace Islam and be married a new to her, or he must give her up to be wedded to a Muslim This order was rigorously enforced.

আক্ষেপ জাগে এই অমানবিক ফারমানের আঘাতে বিচুর্ণ মানবমানবী কেন একবারও উঠে এল না শরদিন্দুর গল্পে।

'বাঘের বাচ্চা' এবং কিশোরদের জন্য সদাশিবের কাণ্ড নিয়ে লেখা গল্পগুলির কেন্দ্রে আছেন শিবাজী। জাতীয়তাবাদযে শরদিন্দুর লেখক চারিত্র্যে একটি মৌল উপাদান তা আমরা লক্ষ করেছি। মারাঠী রাষ্ট্রনায়ক এবং যেসাজী কঙ্ক, জীব মহান া, তানাজী মালসরে, বাজি পসলকর, রত্নাজী প্রমুখ তাঁর ইতিহাসবিখ্যাত অনুচরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়ে দেয় এই গল্পগুলি । এই সব গল্পের পট পুণা, তাঁর প্রিয় বাসভূমি। যদিও 'বাঘের বাচ্চা' যখন লিখছেন ১৯৩১ সালে তখনো তিনি মুঙ্গেরের বাসিন্দা শরদিন্দুর মুম্বাই যাত্রা ১৯৩৮ সালে এবং ১৯৫২ থেকে পুণায় স্থায়ীভাবে বসবাস শু। ১৯৫১ সালে র াজশেখর বসু তাঁকে শিবাজী আরংজেবের বিরোধ উপলক্ষ করে একজন সৈনিককে নায়ক করে গল্প লিখতে অনুরোধ করেন। 'সদাশিবের তিনকাণ্ড' (১৯৫৯) রাজশেখর বসুকেই উৎসর্গ করা হয়েছিল।

শিবাজীর আদর্শ বা কর্মকাণ্ড উনিশ শতকের বাঙালিকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল এই গল্পগুলি তারই শেষ রেশ বলা যায়। মহারাষ্ট্রে টিলক শিবাজী উৎসব প্রবর্তন করেন ১৮৯৫ সালে, বাংলায় তা প্রচলনের চেষ্টা করেন সখারাম গণেশ দেউস্কর। রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিনিধি' বা 'শিবাজী - উৎসবে'র কথা আমাদের মনে পড়বে, কিন্তু শিবাজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর হিন্দু জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করেছিলেন। শরৎকুমার রায় প্রণীত 'শিখগু ও শিখজা

তি' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর রাষ্ট্রসাধনার দুর্বলতার কথা বলেছেন, 'শিবাজী যে হিন্দুসমাজকে মোগল আক্রমণের বিদ্ধে জয়যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আচারবিচারাগত বিভাগ বিচ্ছেদসেই সমাজের একেবারে মূলের জিনিস। সেই বিভাগমূলক সমাজকেই তিনি সমস্ত ভারবর্ষে জয়ী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাকেই বলে বালির বাঁধ বাঁধা--ইহাই অসাধ্যসাধন।' শরদিন্দুর শিবাজীভাবনায় অবশ্য এ ধরনের কোনো দৃষ্টিকোণ দেখতে পাইনা। তবে ফিরঙ্গজি নরসালার সঙ্গে কথোপকথনের সময় সারা দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে শিবাজীকে শূন্যপানে একবার চেয়ে থাকতে দেখি, বিষাদের ইঙ্গিত তাতে স্পষ্ট।

প্রধানত গল্পগুলিতে শিবাজীর প্রশস্ত উদার হৃদয় , দীনদুঃখী প্রজাদের প্রতি মমতা, নেতৃত্ব দেবার অসামান্য শক্তি এবং সর্বোপরি সামরিক কৌশল ও রণনীতির ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। 'বাঘের বাচ্চা' গল্পে ষোল বৎসরের কিশোর শিবাজীর সঙ্গে দাদোজী কোণ্ডুর ঔৎসুক্য জাগানো আলাপচারিতায় ভবিষ্যতের নেতার ঐতিহ্যপরিপন্থী যুদ্ধকৌশল পরিষ্কার ফুটে ওঠে। দাদোজীর প্রাচীন নীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেক্ষিতে শিবাজীর প্রতিবাদী উক্তিগুলি লক্ষ করা যাক
'পালাব, কারণ পালালেই আমার সুবিধে হবে, পরে ডাকাতদের জব্দ করতে পারব। আর লড়ে যদি মরেই যাই, তাহলে তো ডাকাতদের জিত হল।'
'আর যার শক্তি কম, সে যদি চালাকি করে জিতে যায় ?'
'যুদ্ধে হারজিতেই তো আসল -- ধর্মযুদ্ধ হল কি না তা দেখে লাভ কি?'

গল্পগুলিতে ক্ষ পাহাড়ি দেশ মহারাষ্ট্র তার বিশিষ্ঠপ্রাদেশিকতা নিয়ে চমৎকার ফুটে উঠেছে। পূরণপুরী আমটি সম্বর কোশাম্বি, ছোলার ডালের ঝাল চকরি দুধির হালুয়া বাজরির টি কয়েৎবেল বা চিঞ্চের চাটনির মত মারাঠী খাদ্য, নানা লোকাচার এবং আরো রকমারি ডিটেলে একটি জাতির জীবনযাপনের আকর্ষণীয় চিত্রমালা তৈরি হয় যা বর্ণময়, সরস, হৃদয়গ্রাহী।
দুই
শরদিন্দুর গল্পের প্রধান থীম অনেকসময়ই মানবমানবীর আদিম সম্পর্ক এবং তা ঠিক প্লেটোনিক নয়। এই আকর্ষণের তীব্র শরীরী ভিত্তি সম্পর্কে তিনি কুণ্ঠাহীন। বাঙালির সাহিত্য চিরকালই 'রতিরসে ওতপ্রোত' লক্ষ করেছেন শরদিন্দু , কিন্তু আধুনিক (বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক) বাংলা সাহিত্যের যৌন প্রসঙ্গ তাঁর কাছে নিতান্ত অচিকর মনে হয়েছে। 'আসল কথা, কাম বস্তুটাকে sublimate করিয়া তাহাকে আদিরসে রূপান্তরিত করিতে হইবে। পূর্বসূরিগণ তাহাই করিয়াছেন।' পূর্বসূরিদের মানসিকতার যতটা কাছাকাছি শরদিন্দু সমকালীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ততটাই দূরত্ব। সম্ভবত কল্লোলীয় রিয়ালিজম সম্বন্ধেই তাঁর নিম্নোক্ত অনুভূতি, 'এই নূতন অশ্লীলতা ভোল বদলাইয়া আসিয়াছে ; তাহার মাথায় সত্যনিষ্ঠার তাজ, পায়ে ফ্রয়েডের বুটজুতা।' তাঁর মনে হয়েছে বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর বিকৃত বৌদ্ধ দুঃখবাদকে বাংলা সাহিত্যে আমদানি করেছেন, মানিক শুধু বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের প্রচারক। বুদ্ধদেব বসুর বাংলায় তিনি বিদেশী গন্ধ পেয়েছেন, অচিন্ত্যকুমার বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যে লক্ষ করেছেন সংযম ও ধৈর্যের অভাব। সমকালীন সাহিত্যকদের সঙ্গে এই মানসিক ফারাক শরদিন্দুকে তাঁর যুগে একলা পথিক করেছে. তাঁর সমাজদৃষ্টি বা বৃহত্তর অর্থে জীবনদৃষ্টি তাই ঐতিহ্যপন্থী বলয়ে ঘেরা।

ঐতিহাসিক গল্প, অলৌকিক রসের বা গোয়েন্দা গল্প সর্বত্রই আমরা লক্ষ করি সাবেকি ধরনের বলিষ্ঠ ভোগবাদ, জীবন সম্পর্কে একটি সতেজ আগ্রহ। তারই সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে জোরালো হিউমার। বরদাকেন্দ্রিক গল্পগুলিতে প্রেতলোকেও এই হিউমার সমান ভাবে সঞ্চারিত। 'সবুজ চশমা' গল্পে ফিজিক্সের অধ্যাপক বিরাজমোহন সেনের আবিষ্কৃত চশমা পরে বরদা সূক্ষ্ম দেহধারীদের প্রত্যক্ষ করে, সাহেব, চীনাম্যান, ভারতীয়, নিগ্রো বিবিধের মিলনঘটেছে প্রেতলোকে। 'শীর্ণকায় উপবীতধারী ব্রাহ্মণ এবং একটি পালক দেওয়া টুপী পরা ষোলো শতাব্দীর ইংরেজ পাশাপাশি বসে রয়েছেন।' সমবেত ভূতমণ্ডলীর তর্কাতর্কি ও উত্তেজনা অনিবার্যভাবে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিরবিচিত্র শ্রেণীর ভূতের দলের নাচ

স্মরণ করিয়ে দেয়। শৈলীর দিক দিয়ে শরদিন্দু ও সত্যজিতের সাদৃশ্য পাওয়া যাবেনা, কিন্তু গল্পলেখক হিসেবে একই ধরনের ভাবনাবীজ অনেকসময় দুজনকে আকৃষ্ট করেছে। অগ্রজ ব্যোমকেশের পথেই 'স্বীয় কীর্তি ধবজা ধরে' পরবর্তী প্রজন্মের গোয়েন্দানায়ক ফেলুদার আবির্ভাব। গা ছমছম করা পুরনো বাড়ি, প্রেতাত্মা, প্লানচেট পরিত্যক্ত নীলকুঠি এমনকি নীলকরের প্রেত দুজনের গল্পেই দেখা দিয়েছে। অপ্রাকৃতের রহস্যময়কিনারায় দুজনের গল্পই যাত্রা করেছে বারবার। জলম াটির এই গ্লোবটিতে বুদ্ধির অগম্য অভিজ্ঞতার উন্মোচনে বাস্তবের সঙ্গে কুহকের, বিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্বাসের টানাপোড়েনে কত রহস্যই জমে ওঠে, চেতন অবচেতনের ঝাপসা সীমারেখায় পা দিয়ে প্রবল সংশয়ে পাঠকমন যেন অভিভূত হয়ে যায়।

জীবনের প্রথম গল্প শরদিন্দু বরদাকে নিয়েই লেখেন। এই গল্পগুচ্ছে মুঙ্গের এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল স্থানিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে উঠে এসেছে। বাংলা সাহিত্যে মজলিশি ভঙ্গিতে গল্প বলার যে ধারাটি একদা জমজমাট ছিল, মধ্যবিত্ত জীবনের বাঁক বদলে যার শোচনীয় অবলুপ্তি ঘটেছে, ডমধর, নীললোহিত, ঘোষাল, চাটুজ্যেমশায় হয়ে ঘনাদা, টেনিদা পর্যন্ত যার পরিসীমা, বরদা সেই বিস্তীর্ণ আয়েসী ফরাসের এক কোণে আসর জমিয়েছে। শরদিন্দুর যৌবনের আড্ডাস্থল মুঙ্গেরের বাণীমন্দির ক্লাব গল্পের ক্লাবঘরে রূপান্তরিত, রাজশেখর বসুর গল্পে পার্শীবাগান যেমন হাবসীবাগান হয়ে যায়। যুক্তিবাদী অমূল্য ও বিশ্বাসব াদী বরদার মতসংঘর্ষে চকমকির মত ঝিলিক দিয়েছে কৌতুক, 'বরদা বলিল' গত বৎসর আমার প্ল্যাঞ্চেটে ভূত নামাবার শখ হয়েছিল,... যারা জানে শোনে, তাদের পক্ষে ভূত নামানো অতি সহজ ব্যাপার। দরকারী আসবাবের মধ্যে কেবল একটি তেপায়া টেবিল।'

অমূল্য বিড়বিড় করিয়া বলিল, 'আর একটি গুলিখোর।'
সুভদ্রকুমার সেন সার্থক অলৌকিক কাহিনীর মূল ধর্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মূল্যবান একটি আলোকসম্পাত করেছেন, গল্পটি পড়ে শেষ করার পর পাঠকের মনে কিছু সন্দেহ থেকে যাওয়া চাই, অর্থাৎ হলেও হতে পারে, নাও হতে পারে। এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি রাখা যেতে পারে 'আধিদৈবিক' গল্পের পণ্ডিত পুলিনবিহারী পাল সংক্ষেপে পুলিন্দার সিদ্ধ ান্ত, গল্পলেখককে। হঁদম অর্থাৎ হাঁদা সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন, 'প্রমাণের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক কি? ভূত আছে এট া ন্যায়শাস্ত্রমতে প্রমাণ করা যায় না, তাই বলে বিশ্বাস করবনা?... জেনে রাখো যুক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই।'

এই সব গল্পে অনেক সময়ই ঘুরে ফিরে এসেছে পুরনো বাড়ি, 'ক্ষুধিত পাষানে'র প্রাসাদের মতো যার ঘরে বারান্দায়বাগ ানে বহুকালের অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস আর স্মৃতি পুঞ্জিত হয়ে আছে। 'অশরীরী' গল্পে পীর পাহাড়ের এমনি একটি বাড়িতে সুক্ষ্মলে াকের অধিবাসিনীর সঙ্গে গল্পের আইনজীবী নায়কের রহস্যময় সম্পর্ক আত্মহননে জড়দেহ বিসর্জনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ মিলনের ছমছমে সম্ভাবনায় সমাপ্তি লাভ করেছে। এই গল্পটিতে অবশ্য মোপাসাঁর সরাসরি প্রভাব রয়েছে, এবং অন্তিমে মোপাসাঁধর্মী মোচড় এই পর্যায়ের গল্পগুলিতে প্রায়শ দেখায় যায়।

'সকালবেলা উঠে দেখি, বালিশের তলা থেকে সোনার ঘড়ি আর মনিব্যাগটা চুরি গেছে।'
(প্রেতপুরী)
'বিনোদ আসিয়া আমার দুই হাত ধরিল। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, 'তুমিও আর বেঁচে নেই, বন্ধু!' (রক্তখদ্যোত)
'আমরা তিন বন্ধু বিহ্বল জিজ্ঞাসু ভাবে পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। বুকের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল।
তিনদিনের মধ্যে কাহাকে যাইতে হইবে?' (মরণ - ভোমরা)
'আমি অতিকষ্টে গলা হইতে আওয়াজ বাহির করিলাম, 'হ্যা! অতিথি সৎকারের কোনও ত্রটি হয়নি। কিন্তু ভাই, আজ র াত্রেই আমরা বাড়ি ফিরব।' (বহুরূপী)

'নীলকর' ও 'বহুরূপী' দুটি গল্পেরই পটভূমি ধান কাটানোর সময়ের দেহাত, বিহারের গ্রামাঞ্চল। মৃদু শিহরণ জাগানো

একটি শীতার্ত বাতাবরণ দুটি গল্পেই আছে। কিন্তু দুটি ভূত একেবারেই দুই চরিত্রের। বহুরূপীর নিরীহ বাঙালি যুবকের আত্মা মিশুকে এবং সহৃদয়, অন্যদিকে অত্যাচারী বিল্লিসাহেবের ভূত বরদার ভাষায় 'অশ্লীল'। আদিরস ও অলৌকিকের সংমিশ্রণে নীলকরে'র জাত আলাদা। কবুতরীর তুল্য অভিজ্ঞতা অথবা মনোবিকারের আর একটি
উদাহরণ বোধহয় বাংলা সাহিত্যে মিলবে না।

কালো পালক আর নীল পুচ্ছের মোরগ আর নীল লুঙ্গি পরা কালো কুচকুচে আবদুল্লার অদ্ভুত রাসায়নিক মিশ্রণ, পায়ে আলতাপরা ডাইনী কামিনীর রক্তশোষণ, স্ত্রীর ওপর অধিকার বজায় রাখতে প্রমথর শরীরে মৃত মিস্টার দাসের প্রবেশ, মালকোষপ্রিয় জিনের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের মত অজস্র অনুষঙ্গের গল্পের পর গল্পে আমাদের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা বহুযুগাগত অন্ধ বিশ্বাস অর সংস্কারের বীজকে কাজে লাগিয়ে শরদিন্দুর রোমাঞ্চ জাগানো উপভোগ্য এক কল্পলোক সৃষ্টি করেছেন।

তিন

ভূতান্বেষী বরদার সঙ্গে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর একটি গল্পে দেখা হয়েছিল। সেখানে অবশ্য রহস্যের অপ্রাকৃত ব্যাখ্যাকে চূর্ণ করে ব্যোমকেশই বিজয়ী হয়েছে. প্রকৃতপক্ষে শরদিন্দুর পক্ষপাত যে ব্যোমকেশের দিকেই থাকবে তা অনুমান করাই যায়। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রসমূহের মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল ও জনপ্রিয় এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে ইন্দ্রজিৎ সম্বন্ধে মাইকেলের সানুরাগ উচ্ছ্বাসের মতোই শরদিন্দুর আবেগও গোপন থাকেনি, 'ব্যোমকেশ আমার প্রিয় সৃষ্টি, তাহার সংস্পর্শে আসিয়া আমার মস্তিষ্ক ও কল্পনা stimulated হয়।'

ব্যোমকেশের নানা ক্রিয়াকলাপকে শার্লক হোমস এবং বিশ্বসাহিত্যের অন্যান্য কিংবদন্তীতুল্য গোয়েন্দাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন অনেকেই। আপাতদৃষ্টিতে একান্ত সাধারণ পটভূমি থেকে উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত ব্যোমকেশ। তাকে কখনো কখনো পাড়ার এমনকি একেবারে পাশের বাড়ির লোক মনে হয়। ব্যোমকেশ ও অজিত এই জুটি তুলে ধরে শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের চিরচেনা মূর্তি। জয়ন্ত, কিরীটী রায় তো বটেই এমনকি ফেলুদাকেও ব্যোমকেশের তুলনায়খানিকটা সুদূর মনে হয়। এই আপাত সাধারণ পারিপার্শ্বিকের মানুষটির অসাধারণ বুদ্ধির ও বোধের তীক্ষ্ণতা, রহস্য উদ্‌ঘাটনের অসামান্য টেকনিক একটি তীব্র নাটকীয় বৈপরীত্য তৈরি করে। ব্যোমকেশের এই অসাধারনত্ব প্রথম দর্শনে শরব্যবচ্ছেদের মত করে প্রায় দেখিয়েছিলেন তার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী স্যর দিগিন্দ্র কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যভরে যদিও, 'খুলির মধ্যে অন্তত পঞ্চান্ন আউন্স ব্রেন ম্যাটার আছে।... হনু আর চোয়াল উঁচু, মৃদঙ্গমুখ, বাঁকা নাক, হুঁ। ত্বরিতকর্মা, কূটবুদ্ধি। Intuition খুব বেশি, reasoning power মন্দ developed নয় কিন্তু এখনো mature করেনি। শরদিন্দু ফলিত জ্যোতিষচর্চা করতেন এবং ভট্টাচার্যমশাই ব্যোমকেশের কুষ্ঠী করে বলেছিলেন, লগনচাঁদা ছেলে, 'এ ছেলে ঘোর উন্মাদ হবে।' অবশ্য জিনিয়াস বা ঘোর প্রতিভাবান এবং ঘোর উন্মাদের মধ্যে একটা যোগাযোগের কথা বলেন অনেকেই।

১৯১৫ থেকে ১৯২১, কলকাতায় কেটেছিল শরদিন্দুর ছাত্রজীবন। ব্যোমকেশের গল্পগুলিকে কখনো মনে হয় সেই পুরনো কলকাতার এক দুর্লভ অ্যালবাম। চীনে পাড়া, হ্যারিসন রোডের বাড়ির তেতলা, সুকিয়া স্ট্রীট বা কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, আমহার্স্ট স্ট্রীট, জোড়াসাঁকো, এসপ্লানেড, হোয়াইটওয়ে লেডল'র দোকান, রেসকোর্স, দক্ষিণের অভিজাতপল্লী, পরে অবশ্য ব্যোমকেশ ও অজিত কেয়াতলায় বাড়ি করেছে -- কলকাতার এই মানচিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেসমাজের বিচিত্র শ্রেণীর বিচিত্র পেশার মানুষের মিছিল। নন্দদুলালবাবুর মত বদখেয়ালী উত্তর কলকাতার বনেদী বড়মানুষ, নেবুতলার ধনী ব্যবসায়ী সঙ্গীতরসিক আশুতোষ মিত্র, বিজ্ঞান সাধক দেবকুমার, বীমার দালাল গ্রামোফোনপিন রহস্যের মেঘনাদ প্রফুল্ল রায়, ঘাগী হীরে চোর রামনাথ নিয়োগী, অর্ধনারীশ্বর রূপধারী পাকা অপরাধী প্রমীলাপাল, হোমসের প্রোফেসর মরিয়ার্টির মত ব্যোমকেশের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অনুকূলবাবু এদের জটিল মনস্তত্ত্বের আলো আঁধারি ব্যোমকেশের গল্পগুলিকে আলাদা একটি সামাজিক ও মানবিক মাত্রা দিয়েছে শুধু অপরাধী শনাক্তকরণেই যা শেষ হয়না।

কতলকাতার বাইরে যেখানে কাহিনী যাত্রা করেছে সেখানেও শরদিন্দু তাঁর অভ্যাসমত প্রাকৃতিক এবং সামাজিক রেখাচিত্র

স্পষ্টভাবে এঁকে দিয়েছেন। বর্ণনার গুণে পাঠক যেন দেশভ্রমণের বাড়তি স্বাদও খানিকটা পেয়ে যায়, উত্তরবঙ্গের কুমার ত্রিদিবের জমিদারি মুঙ্গের, মহাবাল্মের, কিংবা বাংলাদেশের অজ পাড়াগাঁ পটভূমি যাই হোক না কেন।

ব্যোমকেশের অপরাধী ধরার পদ্ধতি বহু আলোচিত, সকলেই জানেন ছোট কোন ঘটনা, একটি লাল পেন্সিল, ছবির দুষ্মন্তের নীল চোখ, সাইকেলের ঘন্টির আওয়াজ, পেন্সিলে আঁকা একটি 'ব' অক্ষর, নন্দদুলালবাবুর লাল জিভ, হরিনাথ মাস্টারের ফেলে যাওয়া পুরোনো চশমা, দেওয়ালের চুনের ওপর বুড়ো আঙুলের ছাপ, ছেঁড়া কাগজে ভাঙা চিঠির হরফ, এমনি কোনো সাধারণভাবে তুচ্ছ সূত্র ধরে ব্যোমকেশ গল্পজুড়ে জমে ওঠা দ্বাস উত্তেজনা এবং টানটান উৎকণ্ঠার পর অপরাধীকে ধরে ফেলেছে।

এমনি এক রহস্য অনুসন্ধানের সূত্র ধরে ব্যোমকেশের জীবনে প্রবেশ করেছে একটি কৃশাঙ্গী কালো মেয়ে। সত্যান্বেষীর জীবনে সত্যবতীর আবির্ভাব ঘটেছে। লক্ষণীয় শরদিন্দুর নায়িকারা প্রধানত প্রচলিত অর্থেই সুন্দরী, ব্যোমকেশ কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছে শ্যামলা সত্যবতীর বুদ্ধি সাহস এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। এই ঘরোয়া দাম্পত্যজীবন ব্যোমকেশকে আমাদের আরো কাছের মানুষ করে তুলেছে।

ব্যোমকেশের কাহিনীর যে সমাজবীক্ষা তারই প্রসারিত রূপ শরদিন্দুর অন্য বেশ কিছু গল্পে। মানবমনের লুকোনো গলিঘুঁজি, ঢাকা চাপা দেওয়া সামাজিক কেলেংকারি, কখনো রিরংসা এবং অনেকসময়ই প্রেম ও তার বিচিত্র প্রকাশ শরদিন্দুর বিষয় হয়েছে। অধিকাংশ সময়ে এইসব গল্প তির্যক ব্যঙ্গের প্রয়োগে ক্ষুরধার। 'যস্মিন দেশে' গল্পের তপেশস্ত্রীর দুপুরে পাড়া বেড়ানোর অভ্যাসে ত্রোধে অস্থির হয়ে দেশত্যাগ করে, এবং মহারাষ্ট্রের ঘাটি জাতির স্বেচ্ছাবিহারিণী রমণী বিবাহ করে অনায়াসে বলতে পারে, 'এদেশের এই রেওয়াজ--কেউ কিছু মনে করেনা। 'ঝি' গল্পে মনের মতন ঝি না পাওয়া পর্যন্ত বিপত্নীক বড় সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে থাকেন, ঝি পাওয়ার পরেই তিনি ফের অমায়িকচিত্ত। বিবাহ নামক আদিম প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ খুব ভাল নয় অনুমান করেছিলেন শরদিন্দু 'কা তব কান্তা' গল্পে কৌতুকেরছলে আজকের প্রেম ও দাম্পত্যের ফাঁপা সুবিধাবাদের দিকেই তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

কখনো যেন অন্যমনস্কভাবে ছড়িয়ে রেখেছেন সামাজিক ইতিহাসের চূর্ণ তথ্য 'ছোটকর্তা' গল্পে অলৌকিকত্ব ছাড়াও বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের অকারণ মর্যাদাযুদ্ধে অসহায় মেয়েটি যেন নেহাতই অবান্তর এটি আধুনিক পাঠকের চোখ এড়ায় না। অবশ্য প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত পুষতান্ত্রিক সমাজের হাতে কখনো রাজনৈতিক দাবাখেলার ঘুঁটি কখনো ভোগ্যপণ্যরূপে ব্যবহৃত নারীর বিড়ম্বিত জীবনকে শরদিন্দু সচেতন ভাবেই এনেছেন। আবার 'সতী'র মতো গল্পে দেখি যে বদ্ধমূল ধর্মীয় কুসংস্কারকেই সমর্থন জানাচ্ছেন লেখক। তাঁর লেখক চারিত্র্যের এই দ্বিধা এবং পিছুটান স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন অসতর্ক কোনো মন্তব্যে প্রকাশ করে ফেলেন বিশেষ প্রবণতা, সত্যবতীর পুত্রলাভে ব্যোমকেশের প্রতিত্রিয়া স্মরণযোগ্য 'ওদিকেও সোনা।' মনে পড়ে অজিত-ও ভ্রাতুষ্পুত্রলাভের সম্ভাবনার কথাই বলেছিল।

বেণীসংহার (১৯৬৮) গ্রন্থের ভূমিকায় শরদিন্দু ব্যোমকেশ কাহিনীর বিবৃতিকার হিসাবে অজিতকে বাতিল করার কারণ দর্শিয়েছিলেন, 'একে তো ভাষা সেকেলে' 'খাইতেছি' লেখা।' বেচারি অজিতের প্রতি তারস্রষ্টার এই ধিক্কার সত্ত্বেও আমরা কিন্তু বলব শরবিন্দুর প্রতিভার উপযুক্ত বাহন সাধুভাষা। গুভার তৎসম থেকে একেবারে ধুলোমাটিমাখা শব্দ অনায়াসে সেই সাধু গদ্যে স্থান পেয়েছে, কোথাও ভারসাম্যচ্যুতি ঘটেনি। প্রচুর অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ এবং ধ্রুপদী বাগ্‌বিন্যাস থাকলেও অতিব্যস্ত আধুনিক পাঠক তাতে বিন্দুমাত্র বিমুখ হবেন না এমনি এই গদ্যের টান। সাধুভাষার ভারিক্কি চালের সঙ্গে ভাবের লঘুতার যে উপভোগ্য দ্বন্দ্বের কথা পরশুরামের শৈলী সম্পর্কে প্রমথনাথ বিশী বলেছিলেন শরদিন্দু প্রসঙ্গেও তা অনায়াসে বলা চলে। হাসির গল্পগুলিতে তো বটেই ঐতিহাসিক, অলৌকিক, গোয়েন্দা গল্প সব ধারাতেই সরসতার এই অনাবিল উৎসার লেখকের বিশেষ জাত নির্ভুল চিনিয়ে দেয়। রাজশেখর বসুরঅনবদ্য উপমার শরণাপন্ন হয়ে বলা য

ায়, ‘পাঠককে থেমে উপভোগ করতে হয়, যেমন পোলাও খেতে খেতে পেস্তাবাদাম পেলে।’
‘বুলডগের মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ গজাইলে যে রকম দেখিতে হয়, সেইরকম একখানা মুখ - হঠাৎ দেখিলে ‘বাপ রে’ বতলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে ইচছা হয়।’ (সীমন্তহীরা)
‘চন্দ্রানন তন্দ্রার মণিবন্ধে একটি আনন্দ গদ্‌গদ্‌ চুম্বন করিয়া বলিলেন, ইসে--আগে বিয়া তোর করি, তারপর একমাসের মৈধ্যে তোমারে শিখাইয়া ছারমু। তোমাগোর ও কচুর ভাষা একমাসে ভুইলা যাইতে পারবা না ?’ সুখাবিষ্ট কণ্ঠেতন্দ্রা বলিলেন, ‘পারমু।’ (তন্দ্রাহরণ)
সেকালে ঋষিরা যজ্ঞ করিলে বৃষ্টি হইত কিনা এতকাল পরে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কিন্তু ঠাকুমা বড়ি দিলে বৃষ্টি ন ামিবেই।’ (অলৌকিক)
‘ভেঁপুসিং... সাক্ষোভে বলিল, উত্ত মাইজীলোগ খেবল দাদাবাবুকে ধরিয়া লইয়া গিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, সকলে মিলিয়া উচৈচঃস্বরে তাহাকে ‘উল্লু উল্লু’ বলিয়া গালি দিতেছে।’ (ভেনডেটা)

দু একটি শব্দ প্রয়োগে কীভাবে হাসি উছলে পড়ে ‘কর্তার কীর্তি’ থেকে তার উদাহরণ নেওয়া যাক। হৃষীকেশ রায়ের ক্রোধ উপশমের দাওয়াই কাচের গেলাস ভাঙা প্রসঙ্গে, ‘দুই মাস অন্তর কলিকাতা হইতে একগ্রোস করিয়া নূতন কাচের গেল াস আনানো হইত। তাহাতেই কোন রকমে কাজ চলিয়া যাইত।’ কিংবা ‘সন্ন্যাস’ গল্পে ম্যাট্রিক ফেল করে পালানো ছেলের প্রতি স্নেহাতুর পিতার বিজ্ঞাপনধৃত আহ্বান, ‘ফিরিয়া এস, বেশী মারিব না।’ ‘কোন রকমে’ বা ‘বেশী’ শব্দপ্রয়োগ কৌতুকরসসৃজনে যাকে বলে অব্যর্থ।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের দিকপালদের সঙ্গে শরদিন্দুর সাহিত্যচির পার্থক্যের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে।তাঁর অ ামলের সাহিত্য আন্দোলন থেকে অনেক দূরে বিলীন এক যুগের এই শেষ মশালধারী স্বতন্ত্র ভুবন রচনা করেছেন। অ াঞ্চলিকতা তাঁর লেখাতেও এসেছে কিন্তু তার ধরণ একেবারে আলাদা। বাংলা সাহিত্যের এই চতুর্থ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অ াকর্ষণ করেনি নিখাদ প্রকৃতিমগ্নতা, অর্থনৈতিক চাপে কোনো বৃত্তিজীবী মানবগোষ্ঠীর রূপান্তর প্রক্রিয়া,কিংবা বিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার খরস্রোত। তাঁকে স্পর্শ করেনি আধুনিক যুগের পরাক্রান্ত হতাশা ওবিষাদ। কলকাতায় থাকেননি বলেই হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাঙালি জীবনের ক্লান্তি, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগের ধবস, অস্থির অনিশ্চয়তা তাঁর লেখ ায় সেভাবে দেখা দেয়নি। শরদিন্দুর মানসপ্রবণতাও সেদিকে ছিল না, মালাডেতেতিনি উদ্বাস্তু সিন্ধী সম্প্রদায়কে দেখেছেন কিন্তু গল্পের বিষয় হিসেবে তারা তাঁকে টানেনি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের জগতে তাই অতীত পৃথিবীর সঙ্গে বাঙালির চিরকালের জন্য হারিয়ে যাওয়া ভরাট জীবন যেন থমকে দাঁড়িয়ে রইল। চিত্রার্পিত সেই সময়ে, রঙে রেখায় উজ্জ্বল স্মৃতিবিধুর সেই গ্যালারিতে আমরা মাঝে মাঝে পুরনো পথের রেখা খুঁজতে যাব।
গ্রন্থপঞ্জি
শরদিন্দু অমনিবাস আনন্দ পাবলিশার্স / ঐতিহাসিক কাহিনী সমগ্র আনন্দ পাবলিশার্স
ব্যোমকেশ সমগ্র আনন্দ পাবলিশার্স / ‘কোরক’ শরদিন্দু সংখ্যা ১৯৯৬
‘দেশ’ শরদিন্দু ১০০ ৭ আগস্ট ১৯৯৬